মেরু-রহস্যের একাঙ্ক
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

শারদীয়া কিশোর বিজ্ঞান ১৯৮৯
প্রকাশিত কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস

পরিকল্পনা ; সুজিত কুন্ডু
রূপায়নে; স্নেহময় বিশ্বাস

মেরু-রহস্যের একাঙ্ক

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

আমার এ কাহিনীর শুরু সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে। জায়গাটার নাম এবশ্য এখন আমাদের কাছে খুবই পরিচিত—ওখানকার নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড়দের দৌলতে। কিন্তু ক'জন ভারতীয় ও-দেশে গেছে বা ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে আছে জিজ্ঞেস করলে মুশকিলে পড়ব, কারণ সে খবর আমার জানা নেই। তবে আমার এ গল্পের তিন নায়ক রঞ্জন সুজন সিং আর রামচন্দ্রন তিন জনেই জন্ম থেকেই ওদেশের বাসিন্দা।

নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে ওরা ভারতের তিন প্রান্তের লোক—রঞ্জন বাঙ্গালী, সুজন সিং পাঞ্জাবী আর রামচন্দ্রন তামিল নাড়ুর লোক। কিন্তু হলে কি হবে, ওরা সকলেই ছেলেবেলা থেকেই স্প্যানিশ ভাষার কথা বলতে অভ্যস্ত। তবে বাড়িতে অবশ্য নিজের নিজের মাতৃভাষায়ই কথা বলতে হ'ত, নইলে বাবা-মা রাগ করতেন, বলতেন বিদেশী ভাষা তো এখানে না বলে উপায় নেই কিন্তু তাই বলে নিজেদের ভাষা ভুলে যাওয়া মানে তো নিজেদের মনুষ্যত্ব ভুলে যাওয়া। এছাড়া ওরা তিন বন্ধু মাঝে মাঝে পরস্পরের মাতৃভাষাতেও কথা বলত। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হওয়ার ফলে তিনজনেই একে অপরের ভাষা একটু একটু শিখে ফেলেছিল।

ওঃ, জায়গাটার নামই এতক্ষণ বলা হয় নি। দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাপ খুললেই দেখা যাবে ব্রেজিলেরও নীচে এক ফালি লম্বা রাজ্য বরাবর সমুদ্র পর্যন্ত নেমে এসেছে। ব্যস্, ঐ খানেই দক্ষিণ আমেরিকা খতম। আরও বেশ কিছুটা নীচে নামলে অবশ্য সমুদ্রের মধ্যে আর একটা ছোট দ্বীপ পাওয়া যাবে যার নাম গ্রেহাম আইলাণ্ড। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ দেশটার নাম আরজেণ্টিনা—ওস্তাদ ফুটবল খেলোয়াড়ের দেশ,

তাই বলে মনে কর না রাজ্যটি খুব ছোট। বছর কয়েক আগে ওর জনসংখ্যা ছিল দুই কোটী একত্রিশ লক্ষের মত। এখন বোধ হয় আড়াই কোটী ছাড়িয়ে গেছে। বড় বড় পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা আর গভীর জঙ্গলে ভরা না থাকলে আরও বাড়ত। ইয়োরোপ থেকে স্পেনের লোকেরা গিয়ে প্রথম ও দেশটি আবিষ্কার করে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের যুদ্ধে হারিয়ে দেশটি দখল করে নেয়। প্রায় তিনশ' বছর স্প্যানিশরাই রাজত্ব করে ওখানে। তার শ' দেড়েক বছর পরে দেশটি স্বাধীন হয়ে যায়। কিন্তু হালচালে স্প্যানিশদের প্রভাব ততদিনে এদেরকে ছেয়ে ফেলেছে। এখন স্প্যানিশ ভাষাই হয়ে গেছে ওদের নিজস্ব ভাষা এবং যাকে বলে রাষ্ট্রভাষা।

তোমরা হয়তো ভাবছ গল্প করার নামে আমি তোমাদের আরজেণ্টিনার ইতিহাস-ভূগোল শেখাতে বসেছি। না না, মোটেই তা নয়। আমার এ গল্প ঐ তিনটি ছেলেকে নিয়ে। আর তাদের এক বন্ধুকে নিয়ে। অবশ্য ওদের ঠিক ছেলে বলা চলে না, তিনজনেই বড় হয়ে যৌবনে

পৌঁছেছে, লেখাপড়ায় পাট শেষ হয়ে গেছে। তিনজনেই উচ্চশিক্ষিত আর কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ায়। সকলেই বিজ্ঞানী, তবে ওদের বিষয় এক নয়।

ভারতীয় হয়েও ওরা ছেলেবেলা থেকে আরজেনটিনা বাসী হ'ল কি করে এ প্রশ্নটা স্বভাবতঃই মনে আসে। উত্তরটা কিন্তু তেমন কঠিন নয়। ওদের তিন জনেরই বাবা আর-জেনটিনার ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের অফিসে কাজ করেন। ছোট-খাট কাজ নয়, বেশ উঁচু পোস্টেই, অনেক বার বদলীর কথা উঠেছে কিন্তু জায়গাটা ওঁদের খুব ভালো লাগায় ওঁরা সেই বদলীর আদেশ বার বার ঠেকিয়ে রেখেছেন। এখন আর তাই ও নিয়ে কর্তৃপক্ষ কোনও গোলমাল করেন না। ফলে রাজধানী বুয়েনস্ আয়ার্সেই ওঁরা স্থায়ী ভাবে রয়ে গেছেন। ফলে রঞ্জন, সুজন সিং আর রামচন্দ্রনেরও জীবন ছোটবেলা থেকেই ঐ বুয়েনস্ আয়ার্স শহরেই কেটেছে। লেখাপড়াও সব ওখানে। স্প্যানিশ ভাষা ওরা ওখানকার লোকদের মতই ফড় ফড় করে বলে যেতে পারে।

পরিচয় তো দিলাম, কিন্তু গল্প কোথায়? দাঁড়াও, আসছি। নামেই গল্প, আসলে ওরা জানে ওগুলি গল্প নয়, স্রেফ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং এরকম অভিজ্ঞতা অল্প লোকের জীবনেই ঘটেছে। ওরাও কল্পনা করে নি কোন দিন।

বুয়েনস্ আয়ার্সে স্থায়ী ভাবে থাকলেও ওদের তিন জনেরই ছিল বেড়াবার প্রচণ্ড নেশা। দক্ষিণ আমেরিকার কোনও জায়গা ওরা দেখতে বাদ দেয়নি। ঘুরেছে ওখানকার সর্বোচ্চ পর্বত শিখর একোনকাগুয়ায়ে, ঘুরে বেড়িয়েছে প্যাটা-গোভিয়ার গভীর জঙ্গলে। যেখানে সবাই বেড়াতে যায় সে সব জায়গায় না গিয়ে যেখানে কেউ কোনদিন যায় না এরকম জায়গায় ঘুরে বেড়ানোতেই যেন ওদের আনন্দটা বেশি।

পৃথিবীর ম্যাপ্ খুললেই দেখবে আরজেনটিনার এক পাশে রয়েছে বিরাট প্রশান্ত মহাসাগর আর নীচের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণে কিছুটা গেলেই রয়েছে গ্রেহাম আইল্যাণ্ড। ব্যস্, তার আর একটু নীচেই রয়েছে অ্যান্টার্কটিক ওশান যাকে বাংলায় আমরা বলি দক্ষিণ মেরু সাগর। না, সাগর নয়,—মহাসাগর। সাগর হচ্ছে সী-আর মহাসাগর আরও বড়। তাই তাকে বলা হয় ওশান।

ঐ ওশানের পরেই রয়েছে অ্যান্টার্টিক অঞ্চল—অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু অঞ্চল। সুমেরু অর্থাৎ উত্তর মেরুর মত দক্ষিণ মেরু কিন্তু ঠাণ্ডায় জল-জমা বরফের রাজ্য নয়। বরফ দিয়ে মোড়া ঠিকই, কিন্তু ওর নীচে রয়েছে জল নয়, স্থল। তাই ওকে বলা হয় মহাদেশ। অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা, ইয়োরোপ ইত্যাদির মত ওকে দক্ষিণ মেরু মহাদেশ বললে ভুল হয় না। তাই এ যুগের ভৌগোলিকরা ওকে বলেন পৃথিবীর ষষ্ঠ মহাদেশ।

মহাদেশ হলেও ওর নীচে ডাঙ্গার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া ভার। শুধু বরফ আর বরফ। সে বরফ কতদূর পর্যন্ত চলে গেছে আর কত খানি পুরু তার হদিস পাওয়াও কঠিন, যদিও বর্তমানে ঐ মহাদেশটিকে নিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রচুর গবেষণা চালাচ্ছেন। ভারত থেকেও বেশ কয়েক বার বিজ্ঞানীর দল ওখানে কাটিয়ে এসেছেন। এমন কি ভবি-ষ্যতের জন্য তাঁবু খাটিয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও বসিয়ে রেখে এসেছেন আর সেখানে ভারতীয় পতাকা তুলে জায়গাটার নাম দিয়ে এসেছেন দক্ষিণ গঙ্গোত্রী।

ওরা ঠিক করেছে এবার ওরা যাবে ঐ অ্যান্টার্কটিক মহাদেশ দেখতে।

রঞ্জন বলল, এখন তো ওখানে গ্রীষ্মকাল। ছ মাস ধরে তো চলবে দিন। চল, এবার আমরা ও-দেশটাই ঘুরে আসি।

রামচন্দ্রন হেসে বলল, "দিন ঠিকই। কিন্তু ওখানকার গ্রীষ্মকালের শীতও আমাদের দেশের শীতকালের দশগুণ বাড়া। সহ্য করতে পারবি তো?"

রঞ্জন হেসে বলল, "তার জন্য দস্তুর মত তৈরি হয়ে যেতে হবে। একটি বাঙ্গালী মেয়ে, এখন তিনি কোন্ একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে,—বোধ হয় কলকাতার কাছে যাদবপুর,—জিওলজি অর্থাৎ ভূবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা। তিনি পর্যন্ত ওখানে ঘুরে এসেছেন, আর আমরা পারব না?"

রামচন্দ্রন একটু থতমত খেয়ে বলল, "তা বটে। তবে—"

রঞ্জন বাধা দিয়ে বলল, "ওসব তবে টবে নয়। একটু খরচা বেশি হবে। জামাকাপড়, সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করতে হবে, খানিকটা পথ তো বরফ-কাটা জাহাজে যেতে হবে, তার জন্যও কিছু খরচ আছে। তা ছাড়া বরফের রাজ্যে পৌঁছলে আজকাল কেউ বেশি পথ পায়ে হাঁটে না, একটা হেলি-কপ্টারও ভাড়া করতে হবে, আর—"

রামচন্দ্র বাধা দিয়ে বলল, "আর রাত কাটাবার জন্য তাঁবু—"

রঞ্জন হেসে বলল, "আছি তো সবাই বাপের হোটেলে। টাকাও কিছু জমিয়েছি সকলেই। কিছুটা খরচ কর। সবই ব্যাঙ্কে জমালে পৃথিবীতে থাকার কোন মানেই হয় না। তা ছাড়া এই-ই তো, টাকা খরচ করবার সময়। বয়স বেড়ে গেলে এসব উৎসাহ কি আর থাকবে?"

সুজন সিং এতক্ষণ চুপ করে ছিল, রামচন্দ্রনের দিকে তাকিয়ে বলল, "অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমার তো মনে হয় খরচ আমাদের পকেট থেকে সামান্যই যাবে। আমরা তো সাধারণ বেড়ানেওয়ালা হয়ে যাব না—একটা বৈজ্ঞানিক অভিযানও চালাব সেই সঙ্গে। আমাদের এম্ব্যাসী থেকেই হয়তো খরচটা পেয়ে যেতে পারি।"
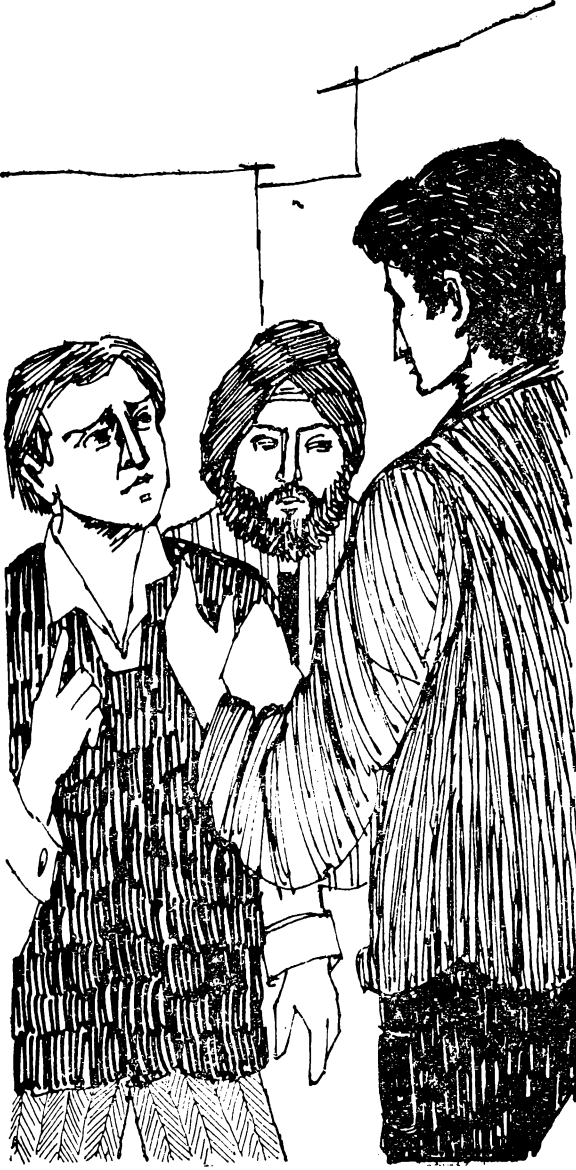
আর রাত কাটাবার জন্য তাবু…

"আর আরজেণ্টাইন সরকারের কাছে জানালে তাঁরাও কি কিছু সাহায্য করবেন না ? নিশ্চয়ই করবেন। পৃথিবীর নানা দেশের সরকার এ ধরনের বৈজ্ঞানিক অভিযানের জন্য যত টাকা খরচ করছেন, অন্ততঃ নিজেদের প্রেস্টিজের খাতিরেই হয়তো আরজেনৃটাইন সরকারও তাদের সামিল হবেন। তা ছাড়া আমরা নিজেরা যাই হই না কেন, এ দেশে আমাদের কিছুটা নাম হয়েছে—কলেজে পড়িয়ে। সেটাও কি ওঁরা ভেবে দেখবেন না ?"

রঞ্জন বেশ জোর গলায় বলল।

রামচন্দ্রন্ একটু বোকা হাসি হেসে বলল, "বেশ, তা যদি করতে পারিস আমার আপত্তি কি ? আমি তো কাপুরুষ নই !"

"এইবার পথে এস দাদা !" রঞ্জন আর সুজন সিং একসঙ্গে বলে উঠল। "তা হলে আজ থেকেই যোগাড়যন্ত্র শুরু করি।"

সুজন সিং-এর বুদ্ধিই শেষে কাজে লাগল। ওখানকার এম্‌বাসী প্রস্তাবটা যেন লুফে নিলেন, আরজেনৃটাইন সরকারও রাজী হয়ে গেলেন—তবে শর্ত হিসেবে তাঁদের নিজেদের দু'-একজন লোককেও সঙ্গে নিতে হবে এই অভিযানের জন্য। তাঁরা লোক খুঁজতে লাগলেন—এও সেই প্রেস্টিজের খাতিরে। নইলে টাকাটা চাইবেন অথচ নাম হবে শুধু বিদেশী একটা এম্‌ব্যাসীর এটা শুনলে দেশের লোক কি বলবে ?

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি লোককে পাওয়া গেল—রঞ্জনই খুঁজে বার করল। তাদেরই ইউনিভার্সিটির এক ছোকরা প্রফেসর—হ্যান্সিস্ হেরাজিনি। একেবারে খাঁটি আরজেণ্টাইন। দুঃসাহসী বলে তার সুনাম আছে. তা ছাড়া সে রঞ্জনদের বিশেষ বন্ধুও। তার ওপর ভাল হেলিকপ্টার চালাতে জানে। খবর শুনে সে বলল, নিশ্চয়ই যাব। এ সুযোগ কেউ ছাড়ে ?"

তিন জনের দল চার জন হয়ে গেল। তা হোক, সরকার যখন খরচের অনেকটাই বহন করতে রাজী তখন আর ভাবনা কি ?

বরফ-কাটা জাহাজ একটা সহজেই ভাড়া পাওয়া গেল। ভিতরে অনেক জায়গা। ডেকে হেলিকপ্টার রাখার প্রশস্ত আঙ্গিনা। আর যন্ত্রপাতি রাখবার পৃথক্ কেবিন। সঙ্গে দুটি তাঁবু নেবারও যথেষ্ট জায়গা আছে। আর এগুলি তো সরকারের নিজেদের ভাঁড়ারেই মজুদ থাকে।

যথা সময়ে সব রকম ভাবে তৈরি হয়ে এই ছোট দলটি অবশেষে সত্যিই বেরিয়ে পড়ল অ্যাণ্টার্কটিক অভিযানের উদ্দেশ্যে। দেখতে দেখতে জল কেটে কেটে দ্রুতবেগে গ্রেহাম আইল্যাণ্ড পার হয়ে এল জাহাজ। এর পরই অ্যাণ্টর্কটিক ওশান। শীত আস্তে আস্তে বাড়ছে। জাহাজ তখনও জল কেটে কেটে চলেছে। কিন্তু না, কিছুটা পরেই মনে হ'ল সমুদ্র আর নীল নেই. তার মাঝে মাঝে সাদা সাদা বরফের ঝোপ। অবশেষে নীল রঙ সম্পূর্ণ মুছে গেল—সম্মুখে সবটাই সাদা বরফের ময়দান। জাহাজ সেই বরফ কেটে কেটে আরও প্রায় 20/25 কিলোমিটার এগিয়ে এসে এবার একেবারে থেমে গেল। সামনে বিস্তৃত শ্বেতশুভ্র ময়দান। কোথাও উঁচুনীচু বলে মনে হ'ল না। আগাগোড়া পুরু বরফে এমন ভাবে ছেয়ে আছে যে সে বরফ কেটে আর

এক পাও এগোবার উপায় নেই। ওপরে বরফের স্তর, তার নীচেও বরফের স্তর তারও নীচে ঐ একই জিনিস। বরফ কাটার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, সে সীমা বা ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে জাহাজের। এবার মালপত্র নিয়ে সেই বরফের ময়দানে নেমে পড়তে হবে।

হেরাজিনি বলল, "আপাততঃ এখানেই কাছাকাছি তাঁবু দু'টো খাটানো যাক। দু'টো তাঁবুই বেশ বড়সড়, ভেতরে শীত আটকাবার লাইনিংও রয়েছে, বাইরের দিক্‌টাও ওয়াটার প্রুফ এক একটায়। দু'জন করে বেশ ভালোই থাকা যাবে। কিন্তু শীত যে রকম বাড়ছে শরীরটাকে আরও গরম জামা দিয়ে না মুড়তে পারলে স্বস্তি পাচ্ছি না।" সকলেই তার কথায় সায় দিল। আরও পুরু লোমের জামা বার করে পরে নিল সবাই। দেখে মনে হ'ল মানুষ তো নয়, যেন চারটে ভাল্লুক।

এখন তো ছ'মাস দিন চলবে, বুঝব কি করে আমাদের দেশে এখন দিন না রাত?" প্রশ্ন করল সৃজন সিং।

ঘড়ি দেখে ঠিক করতে হবে। তা ছাড়া রাতের আলো আমাদের সঙ্গে না মিললেও দিনের চেয়ে একটু ম্লান এখানে। অবশ্য আমরা হয়তো চট্ করে ধরতে পারব না, কিন্তু কিছু দিন এখানে থাকলে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে। তা ছাড়া আমার ঘড়িটা তো ব্যাটারী দিয়ে চলছে, ওতে শুধু সেকেণ্ড, মিনিট আর ঘণ্টারই চিহ্ন বসানো নেই, তারিখও বসানো আছে। চব্বিশ ঘণ্টা হলেই ফট্ করে তারিখটাও বদলে যায়। তবে আমার মনে হচ্ছে এখন আমাদের দেশে রাত্রি শুরু হয়েছে। এখানে দিনের আলো তো থাকবেই। চল যাই, শরীরটাকে আর একটু চাঙ্গা করে একটু ঘুরে আসি।" —বলল হেরাজিনি।

"চাঙ্গা করে মানে?"—প্রশ্ন করল রামচন্দ্রন্।

"মানে আমার কাছে শরীর গরম করার মত বেশ ভালো ব্রাণ্ডি আছে।"

রঞ্জন বলল, "বিদেশে বাস করলে আমাদের কাছে ওগুলো এখনও অচল। বিশেষ করে মা ও সব বাড়িতে ঢুকতেই দেন না। তবে হ্যাঁ, একটু কফি করে নিলেই আমাদের শরীর যথেষ্ট চাঙ্গা হয়ে উঠবে।"

হেরাজিনি মুচকি হেসে বলল, "তোমরা এখনও ও-সব মানো? কিন্তু তোমাদের রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ আমি পড়েছি। রামচন্দ্র থেকে শুরু করে মুনি ঋষিরাও অনেকে ও রসে বঞ্চিত ছিলেন না। তারও আগে,—কি যেন বলে, হ্যাঁ, সোমরস। সেটাও তো ব্রাণ্ডী না হলেও ওরই সমগোত্রীয়। তা ছাড়া তোমাদের সংস্কৃতেও একটি কথা আছে কি যেন কথাটা?"

রঞ্জন হেসে বলল, "একটা নয় দু'টো, প্রথমটা হচ্ছে "প্রবাসে নিয়মো নাস্তি" আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে "যস্মিন দেশে যদাচার" বলে মানেটা বুঝিয়ে ছিল।

শরীর একটু চাঙ্গা হতেই সৃজন সিং বলল, "হ্যাঁ, এবার চল, একটু চারদিকই ঘুরে আসি। দেখি বরফ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় কিনা। উত্তর মেরু বলে হয়তো একটু-আধটু জল কিংবা ভেসে বেড়ানো বরফের চাঁই-এর দেখা মিললেও মিলতে পারত, কিন্তু এখানে ও সব বালাই আছে বলে মনে হয় না। সত্যিই এটা মহাসমুদ্র নয়, মহাদেশ।"

আন্দাজ মিনিট পনেরো হেঁটে হঠাৎ রামচন্দ্রন্ চমকে উঠে বলল, "আরে, এখানে এত মানুষ এল কি করে? দেখছ না না ঐ দিকে? তাকিয়ে দেখ।"

ওরা তাকিয়ে দেখল চারজনই। বেশ খানিকটা দূরে কতকগুলি মানুষ ভিড় করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, ওদের সকলেরই পোশাক এক রকম। সাদা জামার ওপর কালো ওভারকোট। প্রত্যেকেরই বেশ একটু ভুঁড়ি আছে মনে হ'ল, আর মাথায়ও সকলেই একটু বেঁটে।"

"এ কাদের দেশে এসে পড়লাম! শেষ পর্যন্তই এখানেও কি মানুষ থাকে না কি? জানতাম না তো!"

একটু পরেই মনে হ'ল ওদের মধ্যে দু'জনের বোধ হয় ঝগড়া লেগেছে। একে অপরকে ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু ধাক্কা দেবার পদ্ধতিটা ভারি অদ্ভুত। হাত-পা না নেড়ে দু'জনেই দু'জনকে ওদের ঐ ভুঁড়ো পেট দিয়ে প্রাণপণে ঠেলছে।

রঞ্জন এবারে হো হো করে হেসে উঠল, "দূর, ওগুলো মানুষ হতে যাবে কেন. ওগুলো পেঙ্গুইন পাখি। ডানা দু'টো দু'পাশে ঝুলছে, ও দিয়ে ওড়া যায় না তো, তাই মানুষের মত দু' পায়ে হাঁটে। আর লড়াই করবার সময় ঐ রকম পেট দিয়ে গুঁতোগুঁতি করে। অন্য অস্ত্র নেই তো! পেঙ্গুইন আইল্যাণ্ড বলে একটা সিনেমায় আমি দেখেছি ঐ ভাবেই ওরা লড়াই করে।"

ওরা আরও একটু এগিয়ে গেল। পেঙ্গুইন পাখিগুলো কিন্তু ওদের দেখে মোটেই ভয় পেল না, তবে অনেকেই অবাক্ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল—এ কোন্ লোমশ জানোয়ার এল কোত্থেকে!

ওরা ওদের না ঘাঁটিয়ে দূর থেকে কয়েকটা ছবি তুলে নিয়ে অন্য দিকে মোড় ফিরল। কি জানি বাবা, যদি তাড়া করে আর পেট দিয়ে গুঁতোতে আসে! বলা তো যায় না হয়তো পেটেই শিং-এর মত জোর ওদের। ষাঁড়, ছাগল এরাও তো নিজেদের মধ্যে লড়াই করবার সময় মাথা দিয়েই ঠেলাঠেলি করে। কিন্তু কী অসাধারণ জোর সেই মাথাতেই।

এদিক্ ওদিক্ আরও দু' চারটে পেঙ্গুইন একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এবার ওরা সাহস করে ওদের আর একটু কাছে গিয়ে দেখতে লাগল। রঞ্জন বলল, "পেঙ্গুইনও নানা
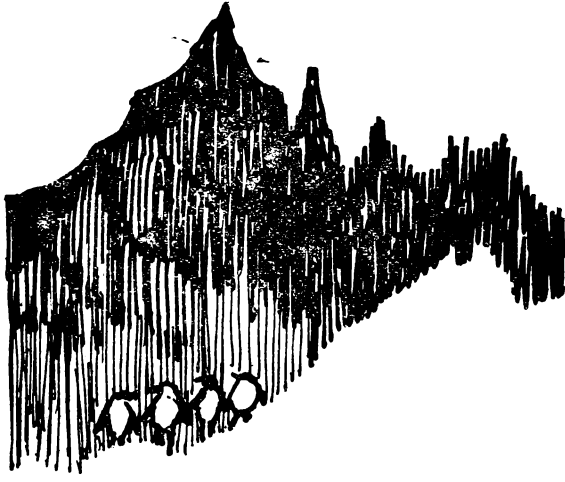
আরে, এখানে এত মানুষ এল কি করে ?

জাতের আছে, তবে এ জাতের পেঙ্গুইন শুধু এখানেই বাস করে। তবে এদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে, হয়তো কিছু দিন পরেই এরা পৃথিবী থেকে লোপ পাবে। পর্যাপ্ত খাবারের অভাব এখানে।"

ওরা আর বেশিক্ষণ ঘুরল না। তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ফিরে গিয়ে কিছু খেয়ে ঘুম লাগাতে হবে। ঘড়িতে পরের দিন শুরু হলেই একটু ব্রেক ফাস্ট সেরে নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ে আরও ভিতরের দিকে যাওয়া হবে বলে ঠিক হ'ল।

হেলিকপ্টার উড়ে চলেছে। আকাশে সূর্যের আলো, কিন্তু মাঝ আকাশে নয়, সূর্য যেন এক দিকে হেলে রয়েছে। তা যাক, অনেক দিন তো ঐ ভাবেই থাকতে হবে তাকে এখানে। বাতাসে ধোঁয়া নেই, ধুলো নেই, অক্সিজেনটাও তাই বেশ নির্মল। বেশ ভালোই লাগছিল।

হঠাৎ দূরত্বের কাঁটা লক্ষ করে রঞ্জন বলল, "আরে, আমরা তো প্রায় তিনশ কিলোমিটার উড়ে এলাম। আগাগোড়া একই দৃশ্য। কোন বৈচিত্র্য নেই কোথাও। তলায় যতদূর দৃষ্টি যায় ধূধূ করছে কেবল সাদা বরফের মাঠ। আর এগিয়ে লাভ আছে ?"

"আর একটু দেখি, পেট্রোল এখনও অনেকটা আছে। কিন্তু শীতটা যেন আগের চেয়ে একটু কম লাগছে না ?"

তাই তো, এতক্ষণ খেয়ালেই আসে নি। ভাল্লুকের মত গরম লোমের জামাটা এবার অনায়াসে খুলে ফেলা যায়।

সবাই নিজের নিজের ওভারকোট খুলে পাশে রেখে দিল, কিন্তু তবু মনে হ'ল শীতটা যেন এখনও কম কম লাগছে। শেষে একে একে কোট, সোয়েটার খুলে ফেলল ওরা। গায়ে রইল শুধু প্যান্ট আর টেরিকটের জামা। কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে গরম লাগছে। এ কি আশ্চর্য ব্যাপার!

সঙ্গে থার্মোমিটার ছিল, খুলে দেখে, একি, এ যে তাপ-মাত্রা 36 ডিগ্রী সেলসিয়াস! এখানে অন্ততঃ এ সময় শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে 36 ডিগ্রী সেলসিয়াস বা তারও নীচে থাকবে বলে ওরা ভেবেছিল। এ যে ওদের দেশের গরম কালের মতই মনে হচ্ছে।

যতই এগুতে লাগল গরম ততই বাড়তে লাগল। শেষে ওরা গেঞ্জী পর্যন্ত খুলে ফেলে একেবারে খালি-গা হয়ে গেল! কী ব্যাপার! যতই এগুচ্ছে ততই গরম বাড়ছে। নাঃ, ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। এ যে একটা নতুন আবিষ্কার! তবে কি দক্ষিণ মেরুর নানা জায়গায় নানা রকম উত্তাপ? কিন্তু তা তো হবার কোনও কারণ নেই।

একটু পরেই দেখা গেল তলাকার বরফের ময়দান আর তেমন সাদা নেই। তার নীচে মাটি দেখা যাচ্ছে। সেখানে ঘাসও গজিয়েছে। মাটি দেখে হেরাজিনি এবার হেলিকপ্টার ডাঙ্গায় নামিয়ে আনল।

হেলিকপ্টার থেকে বেরিয়ে এল সকলেই। তখনও কারো গায়ে কোন জামা নেই। রঞ্জন বলল, "শুনেছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে সব আমেরিকান্ যুদ্ধের সৈন্য হয়ে কলকাতায় গিয়েছিল তারাও অনেকে সেখানে শীতকালেও গায়ে জামা রাখতে পারত না, সুতির প্যান্ট প'রে খালি

এমন সুন্দর জলে নেমে স্নান করে নিলে কেমন হয়...

গায়েই ঘোরাফেরা করত। শীতের দেশের লোক তো! এখানেও তো দেখছি সেই একই ব্যাপার।

একটু হাঁটতেই দেখা গেল সামনের বরফ একদম গলে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। পায়ের তলায় নরম মাটি। তার ওপর দিয়ে খালি পায়েও হাঁটা যায়। ওরা অবাক্ হয়ে এগিয়ে চলল।

এর পরে যে দৃশ্য ওদের চোখে পড়ল তার জন্য ওরা একটুও প্রস্তুত ছিল না। সামনে রয়েছে একটা বেশ বড় হ্রদ। টলটলে নীল জলে বাতাস লেগে মৃদু মৃদু ঢেউ উঠছে।

হ্রদ দেখেই রঞ্জন বলল, "এমন সুন্দর জলে একটু নেমে স্নান করে নিলে কেমন হয়? একটু সাঁতারও কাটা যাবে। আরামও লাগবে। বলেই সে ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়ল জলে। গোটা দুই ডুব দিয়ে, খানিকটা সাঁতার কেটে এগিয়ে চলল, সামনের দিকে। রামচন্দ্রন্ চেঁচিয়ে বলল, বেশি দূর যাস না। অজানা জায়গা, ভিতরে কোন অজানা জলজন্তু থাকাও অসম্ভব নয়। মুখে বলল বটে, কিন্তু সেও সঙ্গে সঙ্গে জলে নেমে পড়ল। তার পর বাকি দু'জনও।

রঞ্জন ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, এদিক্কার জল যে আরও গরম! যেন কেউ উনুনে জল গরম করে সবটা ঢেলে দিয়েছে! তার পরেই "ওরে বাপ!" বলে সে দারুণ ভয় পেয়ে পেছন দিকে ফিরেতে শুরু করল। একটু কাছে এসে বলল, "একি কাণ্ড ভাই! যতই এগোচ্ছিলাম জল ততই গরম লাগছিল। পরে মনে হ'ল সামনের জল থেকে দস্তুর মত ধোঁয়া বেরুচ্ছে আর টগ্‌বগ্ করে ফুটছে সেই জল। এই ঠাণ্ডা বরফের রাজ্যে এ যে এক ভোজবাজি বলে মনে হচ্ছে। চল, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। আর অবগাহন স্নানে দরকার নেই। সকলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। তার কথা শুনে, কেবল রামচন্দ্রন্ আর একটু পরীক্ষা করে দেখবার জন্য খানিকটা এগিয়ে গেল। আরজেন্টিনায় মানুষ হলে কি হবে সে তামিলনাড়ুর ছেলে, তাদের আদি বাড়ি তিন সমুদ্রের মিলন-স্থল কন্যাকুমারিকায়। দেশে তেমন না গেলেও তার বাবা-মা দু'জনেই ওস্তাদ্ সাঁতারু। বুয়েনস্ আয়ার্সের কাছেই সমুদ্র। ওঁরা প্রায়ই সেখানে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে যান। ছেলেকেও সেখানেই সমুদ্রে সাঁতার কাটা শিখিয়ে দেন।

একটু পরে অবশ্য তাকেও ফিরতে হ'ল। পাড়ে উঠে প্যান্টের পকেট থেকে বড় রুমাল বার করে নিংড়ে নিয়ে

সকলেই গা-মাথা যতটা সম্ভব মুছে ফেলল। হেরাজিনি বলল, "এবার তাঁবুর দিকে ফেরা দরকার। সঙ্গে যা পেট্রোল আছে তা নিয়ে আর সামনে এগোনো ঠিক হবে না, তাঁবু পর্যন্ত ফিরতে হবে তো !"

হেলিকপ্টারের কাছে এসে তারা আরও অবাক্ হয়ে গেল। হেলিকপ্টারের চার পাশের নরম মাটি আরও নরম হয়ে গিয়ে হেলিকপ্টারটা তার মধ্যে অনেকটা বসে গেছে। অত্যন্ত ভয়ের সঙ্গে তাড়াতাড়ি হেরাজিনি হেলিকপ্টারটার কাছে নেমে এল, একটু পরীক্ষা করে বলল, "প্রভু যিসাস্-এর দয়ায় রোটারটা এখনও ঘুরবার মত অবস্থায় রয়ে গেছে, আর একটু বসে গেলে আর ওকে তোলা যেত না। বলেই সে কালবিলম্ব না করে হেলিকপ্টারে উঠে বসে সেটা চালিয়ে দিল। রোটারটা যেন বার দুই থতমত খেয়ে শেষে ঘুরতে শুরু করল, হেরাজিনি আস্তে সেটাকে ওপরে উড়িয়ে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে নামিয়ে নিল। বন্ধুদের ডেকে বলল, "চল্, আর দেরী করা ঠিক হবে না। তাড়াতাড়ি উঠে বোস।"

তাদের চার জনের মধ্যে রামচন্দ্রন ভূবিজ্ঞানের ছাত্র। কলেজে সে জিওলজিই পড়ায়। দেখা গেল, আর সবাই কথাবার্তা বললেও সে যেন চুপ করে কি ভাবছে।

তুই চুপ চাপ কেন রে ? রহস্যের সন্ধান কিছু পেয়ে গেছিস বুঝি ? তোদের জিওলজি কি বলে ?"

রামচন্দ্রন হঠাৎ যেন চমকে উঠে বলল, "মনে হচ্ছে কিছু যেন বলে। তোরা উঠে এলে আমি আর একটু সাঁতরে গিয়ে যে আভাস পেয়েছি তা সত্যি হলে সমস্ত ব্যাপারটারই ব্যাখ্যা বেরিয়ে পড়বে। তবে দেশে গিয়ে একটু লাইব্রেরী ঘাঁটতে হবে। তারপর যা ভাবছি তা যদি সত্যি সত্যি মিলে যায় তবে একটা বড় থিসিস হয়ে যাবে।"

"তার মানে ? একটু বল না। পুরোপুরি জিওলজিষ্ট না হলেও আমরা সকলেই অল্পসল্প ও জিনিসটা ভেবেছি।" —বলল রঞ্জন।

রামকৃষ্ণন আবার যেন কি ভাবছিল, রঞ্জনের কথা শুনে যেন আবার সম্বিৎ ফিরে পেল, বলল, "জানিস তো পৃথিবীকে আজ আমরা যেমন দেখছি চিরকাল সেটা এ রকম ছিল না। যুগে যুগে এর রূপ বদলেছে। কখনও এসেছে টেম্পারেট ক্লাইমেট অর্থাৎ মাঝামাঝি অবস্থা,—যেমন আমাদের দেশে এখন চলছে। কখনও এসেছে তুষার যুগ, কখনও এসেছে খরার যুগ—এগুলিকে আমরা ভূতাত্ত্বিক যুগ বলি। বছর দিয়ে এগুলি মাপা যায় না। কোনটা হয়তো একবার এলে দশ লক্ষ বছর ধরে চলে, কোনটা হয়তো আরও বেশি, কোনটা আবার অনেক কম। খরার যুগ এলে সব কিছু শুকিয়ে যায়। জলের অভাবে গাছপালা জন্মাতে পারে না, জল খেতে না পেয়ে কত প্রাণীর বংশ এভাবে পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য লোপ পেয়ে গেছে। কেউ কেউ যুগের সঙ্গে তাল রেখে একটু একটু চেহারা বদলে অন্য চেহারাও নিয়ে টিকে গেছে। তেমনি এসেছে বারে বারে তুষার যুগ। তাও লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। ঠাণ্ডায় শীতে সব কিছু চাপা পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, লোপ পেয়ে গেছে কত জাতের প্রাণী। পৃথিবীর দুই মেরুর দেশে সেই তুষার যুগ এখনও চলছে। একটু হয়তো কমেছে, কিন্তু একেবারে শেষ হয় নি। তাই পৃথিবীর এই দু'টি অংশ এখনও বরফ দিয়ে ঢাকা।

"কিন্তু সব সময় এ রকম ছিল না। ধর আজ থেকে দশ লক্ষ বছর আগের কথা। তখন এই দক্ষিণ মেরুতেও তুষার যুগ আসে নি, ছিল আমাদের মতই টেম্পারেট ক্লাইমেট। তখন এদেশ ছিল সজীব, গাছপালাও নিশ্চয়ই ছিল, ছিল নানা জাতের প্রাণী—যার একটিও এখন দেখা যায় না। আর ছিল নদী, হ্রদ আর পাহাড়। পাহাড়গুলির মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয় ছিল আগুনে পাহাড়—যাকে আমরা বলি ভলক্যানো। সেগুলি যখন জীবন্ত ছিল তখন তা থেকে বেরিয়ে আসত রাশি রাশি ধুলো, লাভা অর্থাৎ গলা পাথর, ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস আর আগুন তো থাকবেই। তাদেরও উৎপাত বড় কম ছিল না। অবশ্য কালক্রমে সেগুলো সবই এখন চিরকালের জন্য নিভে গেছে। কিন্তু সব আগ্নেয়গিরিই একেবারে নিবে নাও যেতে পারে। হাজার হাজার বছর ধরে হয়তো ঐ নিভন্ত অবস্থায়ই তারা থাকে। তার পর হঠাৎ একদিন নতুন করে জেগে ওঠে—শুরু হয় তাদের অগ্নিউদ্‌গীরণের পালা।

"আমার মনে হয় আমরা যে হ্রদে নেমেছিলাম সেখানেও ছিল ঐ রকম একটা আগ্নেয়গিরি যেটা হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ বছর আগে নিভে গিয়েছিল। কিন্তু তার ভিতরকার আগুন হয়তো একেবারে চিরকালের জন্য নেভে নি—ছিল ঘুমন্ত অবস্থায়—ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি ডরম্যান্ট অবস্থা। তার পর এল তুষার যুগ। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিটা সেই নিভন্ত অবস্থায়ই পড়ে রইল, তার ওপর ছড়িয়ে পড়ল বরফের স্তর। কত দিন ধরে তা বলা এখন কঠিন ; কিন্তু হঠাৎ একদিন তার ঘুমন্ত অবস্থায় ছেদ পড়ল—শুরু হল অগ্নি উদ্‌গীরণ। তার ওপরে তখন বরফ চাপা কিন্তু তার আগুনের তেজ অনেক বেশি। ওপরের বরফ গলিয়ে ফেলে সে সেই বরফকে জল করে ফেলল—যার ফলে তৈরি হ'ল এই হ্রদ। হ্রদের আশপাশের বরফও তার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেল না। সে বরফ গলে বেরিয়ে গেল, পড়ে রইল তলাকার নরম মাটি—যার মধ্যে আমাদের হেলিকপ্টার প্রায় বসে যাচ্ছিল।

হ্রদে নেমে গরম জল দেখে আমারও হঠাৎ খুব অবাক্ লাগছিল। অবশ্য তার আগেই সেই গরমের তাপ আমরা হেলিকপ্টারে বসেই টের পাচ্ছিলাম। জলে নেমে আমি রঞ্জনের চাইতেও একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম। কি দেখলাম জানিস্? দেখলাম একটি জায়গা থেকে বেশ খানিকটা বুড়বুড়ি উঠছে। বুড়বুড়ি ওঠা মানে ভিতর থেকে খানিকটা গ্যাস বেরিয়ে আসছে। শুধু বুড়বুড়ি নয়, তার ওপর থেকে বেরিয়ে আসছিল কালো কালো ধোঁয়া। জলের ওপর দিকে কয়েকবার আগুনের স্ফুলিঙ্গও আমার চোখে পড়ছিল। খানিকটা যেন গন্ধকের গন্ধও পাচ্ছিলাম। এই ব্যাপার ক্রমাগত চললে আশপাশের জল তো টগ্‌বগ্‌ করে ফুটবেই। রঞ্জনও তা লক্ষ করেছে। অগ্নি উদ্‌গীরণ যখন আরও বাড়বে তখন হ্রদের জল আর জল থাকবে না, বাষ্প হয়ে মেঘের আকারে উঠে যাবে। জায়গাটা হয়ে যাবে শুকনো একটা মাঠের মত।

"চারদিকে বরফের চাঁই, মাঝখানে এই অদ্ভুত কাণ্ড এ কেবল ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির হঠাৎ জেগে ওঠার ফল ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয় বলেই মনে হচ্ছে। যদি এ রকম একাধিক নিস্তব্ধ আগ্নেয়গিরি এখানে থাকে এবং তারা এক এক করে ফের সজীব হতে শুরু করে তা হলে কি কাণ্ডটাই না ঘটবে এই একটা আগ্নেয়গিরির জেগে ওঠা থেকেই আমরা আন্দাজ করতে পারি। তা যদি হয় তা হলে দক্ষিণ মেরু আর তুষারাচ্ছন্ন থাকবে না, শেষ হবে তার তুষার যুগ। এ থেকে অনেক কিছু ঘটতে পারে। বরফ গলা সেই জল যদি শূন্যে বাষ্প হয়ে উঠে যায় তা হলে সমস্ত আকাশ হয়তো বছরের পর মেঘে ঢাকা পড়ে যাবে। আর যদি তার আগে এগুলো তরল অবস্থায় স্রোতের মত বেরিয়ে আসে তা হলে ছুটে যাবে অ্যান্টার্কটিক ওশানের দিকে। ওশান বা মহাসাগর হলেও অত জল ধরে রাখার সাধ্য তারও হবে না—সে জল বন্যার আকার নিয়ে ভাসিয়ে ফেলবে গ্রেহাম আইল্যাণ্ড, ভাসিয়ে ফেলবে গোটা আরজেন-টাইন রাজ্য, এমন কি ব্রেজিলও চলে যেতে পারে সেই বিরাট জলরাশির তলায়।

"তোরা ভাবছিস এসব আমার কল্পনা। এখন কল্পনা বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু সে রকম দিন যদি আসেই তখন আর তা কল্পনায় থাকবে বলে মনে হয় না—হবে রূঢ় বাস্তব ঘটনা। আমরা হয়তো দেখে যাবার জন্য ততদিন টিকে থাকব না, কিন্তু পরবর্তী যুগের ছেলেদের সে অভিজ্ঞতা হবেই।"

রামচন্দ্রন্ চুপ করল। হেলিকপ্টার তখন ধীরে ধীরে মাটিতে বরফের ময়দানের ওপর নেমে পড়েছে। পেট্রোলও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

এখন আমাদের অভিযান এখানেই শেষ করে আবার সব গুছিয়ে নিয়ে উঠতে হবে সেই বরফ কাটা ময়দানে। তার পর বরফের বদলে আবার সেই জল আর জল। তার পর একদিন ফের আরজেনটাইনের মাটিতে গিয়ে নামতে হবে।" বলল হেরাজিনি।

রামচন্দ্রন্ বলল, "একটা অভিযানে কিন্তু কিছুই হবে না। আসছে বছর কিংবা তার পরের বছর আবার আমরা এখানে আসব, আরও তৈরি হয়েই আসব। তখন হয়তো দেখা যাবে এক নতুন দৃশ্য। জেগে-ওঠা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি জায়গাটার চেহারা একদম বদলে দিয়েছে, নাকি আবার সে ঘুমিয়ে পড়েছে তার লক্ষ লক্ষ বছরের নিশ্চিন্ত ঘুমে। সে ঘুম তার কোন এক দিন ভাঙবে, আবার সে জেগে উঠবে কিছু দিনের জন্য তার দুরন্ত মূর্তি নিয়ে কে বলতে পারে।"